

যুগান্তর

প্রিন্ট: ২০ জুলাই ২০২৬, ০৯:১৪ এএম

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষকদের অবমূল্যায়ন: ঔপনিবেশিক মানসিকতার দীর্ঘ ছায়া



ড. মো. কুদরত-ই-জাহান

প্রকাশ: ১৭ জুলাই ২০২৬, ০৮:৫৩ পিএম



প্রতীকী ছবি



পরবর্তী খেলাসমূহ

আমাদের সমাজে শিক্ষকরা এক সময় ছিলেন জ্ঞান, নৈতিকতা ও সামাজিক নেতৃত্বের প্রতীক। সমাজ তাদের সম্মান করত, রাষ্ট্র তাদের মর্যাদা দিত এবং মানুষ তাদের পথপ্রদর্শক হিসেবে বিবেচনা করত। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের দীর্ঘ সময়ে সেই অবস্থানের আমূল পরিবর্তন ঘটে। শিক্ষকদের পেশাগত মর্যাদা, আর্থিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক অবস্থান ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে। দুঃখজনক হলেও সত্য, সেই অবমূল্যায়নের অনেক উপসর্গ আজও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় রয়ে গেছে।

শুরুতে একটি বহুল প্রচলিত লোককথার কথা বলা যায়। গল্পটির ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও এটি ব্রিটিশ আমলের শিক্ষকদের জীবনসংগ্রামের একটি প্রতীকী চিত্র তুলে ধরে। কথিত আছে, এক ব্রিটিশ কর্মকর্তা স্কুল পরিদর্শনে এসে একজন শিক্ষকের বেতন জানতে চাইলেন। বেতনের অঙ্ক শুনে তিনি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, ‘এত কম আয়ে আপনি সংসার চালান কীভাবে?’ শিক্ষক কোনো উত্তর না দিয়ে পাশের একটি তিন পায়ার টেবিলের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ‘স্যার, আমার সংসারও এই টেবিলের মতো তিনটি পায়ার ওপর দাঁড়িয়ে আছে—এক পায়ার বেতন, এক পায়ার ধার-দেনা, আর অন্য পায়ার সৃষ্টিকর্তার ভরসা।’

গল্পটি হয়তো ইতিহাস নয়, কিন্তু ইতিহাসের একটি বাস্তবতাকে ধারণ করে। ব্রিটিশ শাসনামলে শিক্ষকতা পেশা ধীরে ধীরে এমন এক অবস্থায় পৌঁছায়, যেখানে সমাজ গঠনের অন্যতম প্রধান কারিগর হয়েও শিক্ষকরা আর্থিকভাবে অবহেলিত ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উপেক্ষিত হয়ে পড়েন।

সম্মান থেকে অবমূল্যায়নের পথে

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলায় পণ্ডিত, গুরু ও মৌলভিরা সমাজে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। শিক্ষা ছিল জ্ঞানচর্চার একটি সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব, আর শিক্ষকরা ছিলেন সেই দায়িত্বের প্রধান বাহক। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য ও চরিত্র বদলে যায়।

ঔপনিবেশিক প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য ছিল জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন নয়; বরং প্রশাসনিক কাজে ব্যবহারের জন্য একটি অনুগত মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি করা। টমাস ব্যাবিংটন ম্যাকলের শিক্ষা-দর্শনের প্রভাবাধীন নীতিমালার ফলে শিক্ষাকে মানবিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের পরিবর্তে প্রশাসনিক প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এর ফলে শিক্ষকতা পেশার সামাজিক ও নৈতিক গুরুত্ব ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে।

ব্রিটিশ আমলে বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষকদের বেতন ছিল অত্যন্ত কম। অনেক ক্ষেত্রে একজন দিনমজুর বা শ্রমিকের আয়ের সঙ্গেও শিক্ষকের বেতনের তুলনা করা হতো। সরকারি সুযোগ-সুবিধা, পেনশন, চিকিৎসা ভাতা বা সামাজিক নিরাপত্তা—কোনোটিই অধিকাংশ শিক্ষকের নাগালে ছিল না।

অন্যদিকে ইউরোপীয় শিক্ষকদের জন্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যবস্থা। তারা উচ্চ বেতন, বাসস্থান এবং নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন। একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত দেশীয় শিক্ষকদের জন্য বরাদ্দ ছিল তুলনামূলকভাবে নগন্য পারিশ্রমিক ও সীমিত সুযোগ। শিক্ষা খাতেও ব্রিটিশ শাসনের বৈষম্যমূলক চরিত্র স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল।

ব্রিটিশ সরকার শিক্ষাকে কেবল প্রশাসনিক প্রয়োজনের উপযোগী করে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। ১৯০৪ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইনের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। শিক্ষকদের স্বাধীন চিন্তা, সমালোচনামূলক মতপ্রকাশ কিংবা জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের সুযোগ সংকুচিত হয়ে পড়ে।

স্বদেশি আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে বহু শিক্ষক সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ফলে ব্রিটিশ প্রশাসনের সন্দেহ ও নজরদারির শিকার হতে হয় তাদের। অনেক শিক্ষক চাকরি হারান, কারাবরণ করেন কিংবা অর্থনৈতিক নিপীড়নের মুখোমুখি

হন।

ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার কি এখনো রয়ে গেছে?

স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও একটি প্রশ্ন বারবার সামনে আসে— ব্রিটিশ আমলে শিক্ষকদের যে অবমূল্যায়ন শুরু হয়েছিল, আমরা কি এখনো তার উত্তরাধিকার বহন করছি না? বাস্তবতা হলো, শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা ও পেশাগত গুরুত্ব নিয়ে অনেক আলোচনা হলেও তাদের জীবনমান ও আর্থিক নিরাপত্তার প্রশ্নে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন এখনো পুরোপুরি দৃশ্যমান নয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে নাগরিকদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ মৌলিক চাহিদা পূরণের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ নাগরিকদের ন্যূনতম জীবনমান নিশ্চিত করা কেবল একটি নীতিগত অঙ্গীকার নয়; এটি রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যারা জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তোলেন, সেই শিক্ষকদের নিজেদের মৌলিক চাহিদা কতটা নিশ্চিত করা গেছে?

একজন মানুষের কর্মক্ষমতা, মনোযোগ, সৃজনশীলতা এবং মানসিক সুস্থতার সঙ্গে পুষ্টির সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। পুষ্টিবিদদের মতে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ন্যূনতম জীবনধারণের জন্য প্রতিদিন প্রায় ১,৮০০ থেকে ২,১০০ কিলোক্যালরি শক্তির প্রয়োজন হয়। কিন্তু শুধু ক্যালরি নয়, প্রয়োজন সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য। পর্যাপ্ত পুষ্টির অভাবে একজন মানুষ সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন, মনোযোগ ও স্মৃতিশক্তি কমে যায়, কর্মদক্ষতা হ্রাস পায় এবং রোগ প্রতিরোধক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। একজন শিক্ষক যদি দীর্ঘদিন এমন বাস্তবতার মধ্যে থাকেন, তাহলে তার প্রভাব শুধু তার ব্যক্তিগত জীবনে নয়; শিক্ষাদানের মানের ওপরও পড়বে।

বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন সহকারী শিক্ষক ১৩তম গ্রেডে চাকরি শুরু করেন, যার প্রারম্ভিক মূল বেতন ১১ হাজার টাকা। অথচ বর্তমান বাজারদরে চার সদস্যের একটি পরিবারের ন্যূনতম খাদ্য ব্যয়ই মাসে কয়েক হাজার টাকার সীমা অতিক্রম করে যায়। সেখানে বাসাভাড়া, চিকিৎসা, যাতায়াত, পোশাক, সন্তানের শিক্ষা কিংবা অন্যান্য প্রয়োজনীয়

ব্যয় যোগ করলে পরিস্থিতির বাস্তব চিত্র সহজেই অনুমান করা যায়। ফলে অনেক শিক্ষককে জীবনযাত্রার ব্যয় মেটাতে বাড়তি আয়ের পথ খুঁজতে হয় অথবা ধার-দেনার ওপর নির্ভর করতে হয়।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো, এই আর্থিক ও সামাজিক বাস্তবতা শিক্ষকতা পেশার প্রতি মেধাবী তরুণদের আগ্রহ কমিয়ে দিচ্ছে। একটি জাতির শ্রেষ্ঠ মেধাবীরা যখন শিক্ষকতাকে প্রথম পছন্দ হিসেবে বিবেচনা করে না, তখন দীর্ঘমেয়াদে শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত মান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াই স্বাভাবিক। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জনকারী অনেক শিক্ষার্থী প্রশাসন, ব্যাংকিং, করপোরেট খাত কিংবা বিদেশমুখী পেশাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকতা এমন একটি পেশায় পরিণত হচ্ছে, যেখানে অনেকে পছন্দের কারণে নয়, বরং অন্য কোনো সুযোগ না পেয়ে যোগ দিচ্ছেন। এটি কোনো দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য শুভ লক্ষণ হতে পারে না।

শুধু আর্থিক বিষয় নয়, শিক্ষকদের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে অংশগ্রহণের সুযোগও দীর্ঘদিন সীমিত ছিল। শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকার কথা শিক্ষকদের; কিন্তু বাস্তবে নীতিনির্ধারণ, বাজেট বণ্টন কিংবা শিক্ষা সংস্কারের আলোচনায় তাদের মতামত সবসময় প্রয়োজনীয় গুরুত্ব পায়নি। এর ফলে শিক্ষা সংস্কারের অনেক উদ্যোগ বাস্তবতার সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠেনি।

গবেষণা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেও একই চিত্র দেখা যায়। উন্নত দেশগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জ্ঞান সৃষ্টি ও নীতি প্রণয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচিত হন। অথচ আমাদের দেশে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত অর্থায়ন, অবকাঠামো এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার ঘাটতি রয়েছে। ফলে অনেক শিক্ষক তাদের সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ ঘটানোর সুযোগ পান না।

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো, শিক্ষকদের মর্যাদা হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে জ্ঞানচর্চার সংস্কৃতিও দুর্বল হতে শুরু করে। যে সমাজে শিক্ষক যথাযথ সম্মান ও স্বীকৃতি পান না, সেখানে শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধও ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এর প্রভাব শুধু শ্রেণিকক্ষে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তা জাতীয় উন্নয়ন, সামাজিক মূল্যবোধ এবং মানবসম্পদ গঠনের ওপরও পড়ে।

তবে আশার বিষয় হলো, বর্তমান সরকার শিক্ষা খাতকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে প্রায় ১ লাখ ২২ হাজার ৪৯৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে, যা দেশের ইতিহাসে এ খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এ বরাদ্দ মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রায় ২ শতাংশের সমান, যা আগের অর্থবছরের ১.৩৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সঙ্গে সরকার দীর্ঘমেয়াদে শিক্ষা খাতে সরকারি ব্যয় জিডিপির ৫ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যও ঘোষণা করেছে। পাশাপাশি মানসম্মত, অন্তর্ভুক্তিমূলক, প্রযুক্তিনির্ভর ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এসব উদ্যোগ ইতিবাচক; তবে শিক্ষা খাতে বিনিয়োগের প্রকৃত সুফল পেতে হলে সেই বিনিয়োগের কেন্দ্রে শিক্ষককে স্থান দিতে হবে। কারণ দক্ষ, প্রেরণাদীপ্ত ও মর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষক ছাড়া কোনো শিক্ষাব্যবস্থাই তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না।

কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তন কেবল অবকাঠামো, প্রযুক্তি বা পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে সম্ভব নয়; এর কেন্দ্রে থাকতে হবে শিক্ষককে। শিক্ষকদের ন্যায্য বেতন-ভাতা, স্বাস্থ্যসেবা, পেশাগত প্রশিক্ষণ, গবেষণা সহায়তা, নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাত্রা নিশ্চিত করা ছাড়া শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন অর্জন সম্ভব নয়। কারণ একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয় শ্রেণিকক্ষে, আর সেই শ্রেণিকক্ষের প্রাণশক্তি হচ্ছেন শিক্ষক।

লেখক: উপাচার্য, বগুড়া বিশ্ববিদ্যালয়